বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

রসপুরাণ : অষ্টবিধ নাট্যরসে প্রযোজনা নিরীক্ষা

আহমেদুল কবির*

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্বে 'রস'কেই আখ্যানের সার এবং রসাস্বাদই চূড়ান্ত ফল বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের শ্রেণি-বিভাগ অবলম্বন করেই এই রস তত্ত্বের উদ্ভব, আচার্য ভরত যার প্রবক্তা এবং তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* যার আকর গ্রন্থ। *নাট্যশাস্ত্রে*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত রস-এর স্বরূপ, প্রকার এবং স্বভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে রস বিষয়ক বহু অমীমাংসিত আলোচনারণ্যে প্রবেশের প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধে নেই। কেবল মাত্র সাধারণ্যে প্রচলিত *নাট্যশাস্ত্র*-এর মতকে কেন্দ্র করে *রসপুরাণ* প্রযোজনার আলোকে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রথমে *রসপুরাণ* প্রযোজনার নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত অষ্টবিধ নাট্যরস নিয়ে প্রযোজনা নিরীক্ষাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই আলোচনার মাধ্যমে হয়তো সংস্কৃত নাট্যের ভিত্তিমূলে রসতত্ত্ব কী প্রকারে কার্যকর হয় তা প্রমাণিত হবে। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যকলা বিভাগসমূহে সংস্কৃত নাট্য প্রযোজনার প্রামাণিক রূপটি কেমন, তাও প্রযোজনা নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসবে।

চাবি শব্দ: রস, রসপুরাণ, নাট্যশাস্ত্র, প্রযোজনা, নিরীক্ষা

১

ভারতীয় তথা সংস্কৃত সাহিত্যে নন্দনের একটি উপাদান দৃশ্যকাব্য। এই কাব্য দর্শক শ্রোতাকে অনেক কিছু প্রদানে সমার্থক হলেও রসাস্বাদ-জনিত পরম আনন্দই তার মূল উপাদান। সংস্কৃত নাট্যে রসকেই আখ্যানের সার এবং রসাস্বাদই চূড়ান্ত স্বীকৃতি বলে গণ্য। রসাস্বাদ তাঁরাই গ্রহণে সমর্থ যাঁদের উপযুক্ত মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ রয়েছে। এই শ্রেণির দর্শককে বলা হয় রসিক জন বা সহৃদয়। সহৃদয় দর্শক নাটলিপি অনুশীলন, বিশ্লেষণ এবং বর্ণিত ভাবে তন্ময় হবার যোগ্যতা রাখেন। নাতিদীর্ঘ সংলাপে চরিত্রের মনের ভাবের সাথে নিজের ভাব মিলিয়ে একাত্মতা অনুভব করতে পারেন এবং উপলব্ধি করতে পারেন রসহীন রচনা নিরর্থক, আর ইতিবৃত্ত হলো নাট্যের শরীর। এখন প্রশ্ন আসতে পারে *রসপুরাণ* কী? উত্তরে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজিত *রসপুরাণ* (২০১৯) একটি সংস্কৃত আখ্যান আশ্রিত নাট্য। অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবির-এর নির্দেশনায় তৎকালীন দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীবৃন্দ ২৫ এপ্রিল হতে ০৪ মে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নাটমণ্ডল মিলনায়তনে প্রতি সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় নাটকটি মঞ্চায়ন করে।[১] *রসপুরাণ* প্রযোজনাটি মূলত অষ্টরসের মিশ্রণ। মাত্র আটটি এপিসোড মিলে এই নাটক। অষ্টরসাখ্যানস্বরূপ এই প্রযোজনায় যে অদৃশ্য সুতোটি এক এপিসোডের সাথে আরেক এপিসোডের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে তা হলো রস। এপিসোডের আখ্যান-বস্তু নির্মাণে নির্দেশক রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, প্রচলিত লোক-কাহিনি ও

* অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত নাট্যের দৃশ্য সংশ্লেষ করেছেন। এভাবে অষ্টরসের সম্মিলনে তৈরি করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আটটি এপিসোড। আর দেখানো হয়েছে কীভাবে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে সুন্দর ও নির্মল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় মানুষের সভ্যতা। মাত্র এক ঘণ্টা দশ মিনিটের নাটক *রসপুরাণ*। অথচ দর্শক যেন এক মহাকাল ঘুরে আসেন। নির্দেশক বলেন,

> সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোই বিভাগ দর্শক সম্মুখে বারংবার মঞ্চায়ন করেছে। কিন্তু *নাট্যশাস্ত্র*-এর আটটি রসকে সমান বা একরূপ প্রাধান্য দিয়ে বিভাগ এ-পর্যন্ত কোনো নাটক মঞ্চায়ন করেনি। তাই শিক্ষার্থীদের নাট্যশাস্ত্র ভিত্তিক অষ্টরস বিষয়ক একটি পূর্ণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই নাট্যশাস্ত্রবর্ণিত ভাব ও রসনিষ্পত্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অষ্টরসের আখ্যানে *রসপুরাণ* মঞ্চায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি।[২]

নির্দেশকের উপর্যুক্ত উক্তির যথার্থতা খুঁজতে, ১৯৯৪ সালে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দর্শক সম্মুখে সংস্কৃত নাট্য প্রদর্শনীর যে তথ্য ক্রুশিয়র মতে পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করি। তা হলো, ১৯৯৫ সালে ড. ইসরাফিল শাহীন-এর নির্দেশনায় মঞ্চায়িত হয় ভাস বিরচিত *উরুভঙ্গ*। পরবর্তীকালে অধ্যাপক ওয়াহীদা মল্লিক নির্দেশিত ভাস বিরচিত *মধ্যমব্যায়োগ* মঞ্চায়িত হয় দু'বার, যথাক্রমে ২০০৪ ও ২০১০ সালে। পুনরায় *উরুভঙ্গ* ২০০৮ সালে অধ্যাপক ওয়াহীদা মল্লিক-এর নির্দেশনায় এবং আশিকুর রহমান-এর নির্দেশনায় *মৃচ্ছকটিক* ২০০৯ সালে মঞ্চায়িত হয়। এছাড়া আহমেদুল কবির নির্দেশিত বুদ্ধদেব বসু রচিত *প্রথম পার্থ* ২০১২ সালে মঞ্চায়িত হয়। উপর্যুক্ত *উরুভঙ্গ, মধ্যমব্যায়োগ, মৃচ্ছকটিক* ও *প্রথম পার্থ* নাট্যের নাট্যরস বিবেচনা করলে লক্ষ করা যায়, নাটকে সব রসের উপস্থিতি থাকলেও প্রত্যেকটির একটি প্রধান রস বা অঙ্গী রস রয়েছে। যেমন– *উরুভঙ্গ, মধ্যমব্যায়োগ* ও *প্রথম পার্থ*-এর অঙ্গী রস 'বীর' এবং *মৃচ্ছকটিক*-এর অঙ্গী রস 'শৃঙ্গার'। এক্ষেত্রে নির্দেশকের উক্তির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। এবং বলা যায়, *রসপুরাণ* প্রযোজনাটি মঞ্চায়নের পেছনে নির্দেশকের সরাসরি যে কারণটি ক্রিয়াশীল ছিলো তা হলো 'নাট্যরস'। এ-প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন,

> বলতে গেলে একধরনের বাধ্য হয়েই বিকল্প পথের সন্ধান করি। নাট্যনির্মাণের শুরুতেই আমাদের চিন্তা ছিলো রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টিশীল সংযোগ স্থাপন এবং উভয়ের উদ্ভাবনী গবেষণার মাধ্যমে রসসমূহকে একই আধারে সংশ্লেষিত করা।[৩]

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতীয় নাট্যাঙ্গন বহুপূর্ব থেকেই 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' থেকে সাংস্কৃতিক মৌল উপাদান সংগ্রহ করে নাটক মঞ্চায়ন করেছে। বাংলাদেশেও ইসলামিক মিথ (কারবালার) ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটক মঞ্চায়ন হয়েছে, যেমন– ঢাকা পদাতিকের *বিষাদ সিন্ধু*, দেশজ নাট্য বিশেষ করে 'জারী গান' ও 'বিচার গানে'ও এর প্রভাব বর্তমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নির্দেশক *রসপুরাণ* নাট্যের কাহিনি গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন উৎস থেকে। ইউটিউব-এ প্রাপ্ত *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভিডিও দেখে বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, নাট্য নির্মাণে নির্দেশক একক কোনো পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেননি। এবং ইতিবৃত্ত– স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য মেনে অগ্রসর হয় না। *রামায়ণ, মহাভারত, মৃচ্ছকটিক* এবং বিভিন্ন 'পুরাণ' আখ্যানের খণ্ডাংশ ও প্রচলিত লোক-কাহিনি পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে শূদ্রক রচিত *মৃচ্ছকটিক*-ই একমাত্র পূর্ণ সংস্কৃত নাট্য, যেখান থেকে 'জুয়ার আড্ডা'র দৃশ্য সংশ্লেষ করা হয়েছে। নির্দেশক

উৎস থেকে কেবল কাহিনির বীজ গ্রহণ করেছেন, পরিবেশনকালে আপন প্রতিভায় নাটকে অষ্টরস সংযোজন করে প্রযোজনাকে করে তুলেছেন আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে নির্দেশক নাট্য কাহিনি নির্মাণে ছিলেন স্বাধীন। তাইতো *রসপুরাণ* প্রযোজনার কাহিনিতে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি বৈচিত্র্য আছে তার উৎস নির্বাচনেও। পাণ্ডুলিপি নির্মাণ প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন,

> ধ্রুপদী আঙ্গিকের এই প্রযোজনাকে দর্শকের সামনে উপস্থাপনের জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের কাজ শুরু হয় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে। নাট্যশাস্ত্রের আটটি রসকে প্রাধান্য দিয়ে ধ্রুপদী বিভিন্ন উৎস থেকে পাণ্ডুলিপির কাঠামো নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের দুটি মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এবং অন্যান্য ধ্রুপদী নাটক থেকে আখ্যান-বস্তু চিহ্নিত করা হয়।[৪]

অর্থাৎ নাটকটি কোনো একক পাণ্ডুলিপি থেকে নয় বরং পৃথক উৎস হতে প্রাপ্ত আখ্যানকে সংযোজিত করে। সংস্কৃত নাট্য বিষয়ে পণ্ডিতমহলে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। সে-সকল বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* নাট্যের বিভিন্ন শ্রেণি-বিভাগ করা হয়েছে। আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* রূপককে (আধুনিক পরিভাষায় নাটক) দশ ভাগে[৫] ভাগ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অলংকারগ্রন্থসমূহে আরও আঠারো প্রকার[৬] উপরূপকের কথা বলা হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ-পূর্বক রূপকের বিভাগের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, এদের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে *রসপুরাণ*-কে কি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাট্য বলা যায়? এ-প্রসঙ্গে কবির বলেন,

> আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* নাট্যের যে শ্রেণি-বিভাগের কথা বলা হয়েছে, সেই বিচারে *রসপুরাণ*-কে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটক বলা যাবে না। প্রথমেই বলেছি আমার চিন্তা ছিলো রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করা। সংস্কৃত নাট্য ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত নাট্যের যে পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট রয়েছে সে-সকল পাণ্ডুলিপি 'নির্দিষ্ট' উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছেনা। তাছাড়া আমরা বারংবার সেখানে হাত পেতেছি। তাই আমাকে বিকল্প পথ খুঁজতে হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের উৎস অনুসন্ধান করলে আমরা– রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, প্রচলিত লোক-কাহিনি, ইতিহাস ও রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শন এবং কবি-কল্পিত বিষয়-বস্তুই পাই। *রসপুরাণ*-এর পাণ্ডুলিপি নির্মাণেও আমরা এসকল উৎসকে গ্রহণ করেছি। সর্বোপরি *রসপুরাণ*-কে সংস্কৃত নাট্য বলার প্রয়োজন নাই। নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত অভিনয় রীতি অনুসারে এর কাঠামো অগ্রসর করার চেষ্টা হয়েছে এবং আখ্যানসমূহ প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদ আশ্রিত। যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে রসসমূহের মধ্যে সৃষ্টিশীল সংযোগ স্থাপন এবং সংশ্লেষ করা।[৭]

নির্দেশকের উপর্যুক্ত উক্তির মৌল উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও যথার্থতার পাশাপাশি সমগ্র পরিবেশনা জুড়েই রয়েছে সংস্কৃত নাট্যরীতির ব্যবহার। তাই *রসপুরাণ*-কে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাট্য না বলে নাট্যশাস্ত্র নিঃসৃত প্রযোজনা হিসেবে বিবেচনা করলে ভাষার অর্থগত ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে আখ্যানসমূহকে একত্র করা হলো, সে-সম্পর্কে কবির বলেন,

> অষ্টরসাখ্যানস্বরূপ এই প্রযোজনায় যে অদৃশ্য সুতোটি এক দৃশ্যের সাথে আরেক দৃশ্যের মধ্যে ভাবগত সংযোগ স্থাপন করেছে তা হলো রস। ধারণাগত কাঠামো (কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক) রূপে রসনিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার পটভূমিতেই খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যের সংশ্লেষণের মধ্যদিয়ে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে সুন্দর ও নির্মল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় আমাদের প্রযোজনা *রসপুরাণ*।[৮]

অর্থাৎ নির্দেশকের উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, *রসপুরাণ* নাট্য সরাসরি কোনো সংস্কৃত নাট্যের অনুবাদ বা রূপান্তর নয়। আলাদা-আলাদা উৎস থেকে আখ্যান সংগ্রহ করে হাইপারলিংক

(Hyperlink) হিসেবে *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত অষ্টরস-এর ব্যবহার হয়েছে। নাট্য উপস্থাপনে নির্দেশকের সমগ্র মহড়া পর্বটির উদ্দেশ্য ছিলো সন্ধান– নাট্যরস সন্ধান। পাণ্ডুলিপি, প্রযোজনা ডিজাইন এবং নাট্যের অন্যান্য সকল নাট্য-উপাদান ছিলো উল্লেখিত সন্ধান প্রক্রিয়ার ফসল। এই লক্ষ্যে মহড়ার প্রারম্ভে শিক্ষার্থীদের অভিনয়রীতি ও আখ্যানসমূহের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধ্রুপদী নাট্যপাঠ, পিটার ব্রুকের চলচ্চিত্র 'মহাভারত'-সহ বিভাগে পূর্বে মঞ্চস্থ সংস্কৃত প্রযোজনার ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি 'আঙ্গিকাভিনয়'-এর প্রস্তুতির জন্য অঙ্গসঞ্চালন অনুশীলন যথাযথভাবে শুরু হয়। সাক্ষাৎকারে প্রযোজনার জনৈক অভিনেতা বলেন,

> আমরা নির্ধারিত বৎসরের জানুয়ারি মাস থেকে মহড়া শুরু করি। মহড়ায় 'স্টাইলাইজড' পরিবেশনার কৌশল রপ্ত করা শুরু করি। 'লার্জার দেন লাইফ' ব্যাপারটা বুঝতে আরম্ভ করি। প্রতিটি নাট্যরস বিষয়ে 'ইম্প্রোভাইজেশন' করতে থাকি। এতে করে একসময় উপলব্ধি করি আমরা চরিত্রের প্রয়োজনে আরোপিত অভিনয় করছিনা।[৯]

নাট্যনির্দেশক কবির বলেন, "একজন দক্ষ অভিনেতার দৈহিক উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ তাই *রসপুরাণ* নির্মাণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় আঙ্গিকাভিনয়ে।"[১০] শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ মিথস্ক্রিয়ায় পাণ্ডুলিপি নির্মাণের পর নির্বাচিত অংশগুলো নিয়ে পুনঃসৃজনের লক্ষ্যে শুরু হয় তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন (ইম্প্রোভাইজেশন) ভিত্তিক মহড়া। 'থিয়েটার গেমস্'সহ অপর কিছু অনুশীলনের লক্ষ্যে, প্রতিটি রসের 'নাট্যক্রিয়া' নির্ধারণ করে চলে মহড়া। যে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া নিষ্পন্ন করলেই নাট্য সৃষ্টি হয়, তাই ক্রিয়াটি শারীরিক না মানসিক সেদিকেও গুরুত্ব দিয়ে চলে মহড়া। এভাবে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে, সৃজনশীল উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে *রসপুরাণ* নাট্য প্রযোজনার বিভিন্ন চরিত্র নির্মাণ ও রূপায়ণ করা হয়। কবির বলেন, "নাটকটির উপজীব্য হলো মানুষের সভ্যতার দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির ইতিহাস, যুদ্ধ, হত্যা, ভয়, ক্রোধ শেষে যূথবদ্ধ জীবনে অফুরান ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা।"[১১]

২

নাট্যরস কী? এর সমৃদ্ধ ও যথাযথ উত্তর সরাসরি বা এক বাক্যে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বলা যায়, রস অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় কিছু নয়, একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা। *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রবর্তক ভরত, নাট্যরসের উৎপত্তি ও আস্বাদ প্রক্রিয়াকে লৌকিক রসের উৎপত্তি ও আস্বাদ-প্রকারের সাথে সাদৃশ্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। লৌকিক রস নিষ্পন্ন হয়– বিবিধ ব্যঞ্জন, ওষধি ও দ্রব্যের সংযোগে। ঠিক সেভাবেই নানা ভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। 'রস' একটি পারিভাষিক শব্দ। রস শব্দের মুখ্য অর্থ আস্বাদ।[১২] রস আস্বাদিত হয় বলেই আলংকারিকগণ 'রস' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ভরত-এর *নাট্যশাস্ত্রে* উল্লেখ রয়েছে,

> [...] নানা ব্যঞ্জনে সংস্কৃত অন্ন ভক্ষণ করতে করতে রসসমূহ আস্বাদন করেন, এবং আনন্দাদি লাভ করেন, তেমনই সহৃদয় দর্শকগণ নানা ভাবের বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে ব্যক্ত স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন করেন ও আনন্দাদি উপভোগ করেন। এর থেকে নাট্যরস ব্যাখ্যাত হল।[১৩]

অর্থাৎ, ভরত-এর উক্তিটি যথাযথ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, সকল রসিক দর্শকই রস আস্বাদন করে থাকেন। রস হলো চিত্তবৃত্তির এক ধরনের অবস্থা বা পরিণতি। এ-রকম রসই

কাব্যের হৃদয়। নাট্যরসের আশ্রয় নাট্য, অভিনেতা-অভিনেত্রী বা নাট্যকার নয়। সহৃদয় দর্শকের মনই এর আধার। আর রস ব্যতীত কোনো বস্তু বা শিল্পই আনন্দদায়ক হতে পারে না। ভরত বলেন, 'যেমন ভোজনরসিক ব্যক্তিগণ বহু দ্রব্য ও ব্যঞ্জনযুক্ত ভোজ্য ভোজন করতে করতে (রস) আস্বাদন করেন, তেমনই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবের অভিনয়যুক্ত স্থায়ি ভাবসমূহ মনে মনে আস্বাদন করেন। সেইজন্য নাট্যরস খ্যাত।'[১৪] এছাড়া জনৈক সমালোচক রস আস্বাদন সম্পর্কে বলেন, 'সহৃদয়গণের রত্যাদি স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া (রূপান্তরিত হইয়া) রসতা প্রাপ্ত হয় [...]। যেমন, দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয় সেইরূপ সহৃদয়গণের বিভাবাদি জ্ঞানই রসে পরিণত হয়।'[১৫]

অতএব, মানুষের চিত্ত গঠিত হয় কতক বৃত্তি দ্বারা। আর চিত্তবৃত্তির মধ্যে রয়েছে স্থায়ীভাব। সহৃদয় দর্শক যখন কোনো শিল্প দর্শন করেন তখন তাঁর স্থায়ীভাবের যে কোনো একটি ভাব এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যে তখন তিনি ঐ নাট্য বর্ণিত ভাবে তন্ময় হয়ে যান এবং নিজের হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দে মগ্ন হয়ে পড়েন, তখনকার অবস্থাকেই বলা যায় রসাস্বাদ। ভাবই পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলে লাভ করে রসরূপতা। রসের মাধ্যমে শিল্পের সর্বশেষ পরিমাপ হয়। আর ভাব রসেই আশ্রিত থাকে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থের 'রসবিকল্প অধ্যায়ে' নাট্য রসকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন, 'শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।'[১৬] সাথে সাথে তিনি রস-সমূহের স্থায়ী ভাব, বর্ণ ও দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। স্থায়ী ভাবসমূহ এবং তা থেকে উৎপন্ন রসসমূহ হলো, 'রতি ভাব থেকে শৃঙ্গার, হাস থেকে হাস্য, শোক দ্বারা করুণ, ক্রোধ থেকে রৌদ্র, উৎসাহ যোগে বীর, ভয় দ্বারা ভয়ানক, জুগুপ্সা থেকে বীভৎস ও বিস্ময় থেকে অদ্ভুত।'[১৭] বর্ণসমূহ হলো, 'শৃঙ্গার হয় শ্যামবর্ণ, হাস্য সাদা, করুণ কপোতবর্ণ (অর্থাৎ ধূসর), রৌদ্র লালা, বীর গৌর, ভয়ানক কাল, বীভৎস নীল ও অদ্ভুত হলুদ।'[১৮] দেবতা হলো, 'শৃঙ্গারের দেবতা বিষ্ণু, হাস্যের প্রথম, করুণের যম, রৌদ্রের রুদ্র, বীরের মহেন্দ্র, ভয়ানকের কাল, বীভৎসের মহাকাল ও অদ্ভুতের ব্রহ্মা।'[১৯]

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থে নাট্য রসকে যে ক্রমে বিনস্ত করেছেন তার ব্যতিক্রম *রসপুরাণ* প্রযোজনায় লক্ষ করা যায়। *রসপুরাণ* নাট্যের রসভিত্তিক ক্রম হলো– করুণ, বীভৎস, অদ্ভুত, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীর ও শৃঙ্গার। এছাড়া নাট্যের শুরুতে নান্দী, সূত্রধার (কোনো কোনো প্রদর্শনীতে), আখ্যান এবং শেষে ভরতবাক্য পাঠ যুক্ত করে নাট্যের সমাপ্তি ঘটে। নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয় রীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ ঘটে *রসপুরাণ* প্রযোজনার নির্মাণ কৌশলে। এ-প্রসঙ্গে কবির বলেন,

> অভিনয়ের 'তত্ত্ব' ও 'রস'-এর ধারণার নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রামাণিক পাণ্ডুলিপি ভরত মুনি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। যেহেতু রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করা আমাদের লক্ষ ছিলো তাই আমরা ধ্যনমগ্ন হয়ে তা পাঠ করেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি। নাট্যভাষা নির্মাণ করেছি। পাণ্ডুলিপি নির্মাণ করে নাট্যশাস্ত্র-এর রসভিত্তিক ক্রমের ন্যায় বিনস্ত করে দেখি, কাহিনিতে পূর্ণ নাট্যের সৃজনশীলতা অনুপস্থিত। নাট্যের মূল বক্তব্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই ক্রমান্বয়ে সংশোধন ও সংযোজন করে সর্বশেষ স্তরে উপনীত হই। পাশাপাশি, আমরা *রসপুরাণ* প্রযোজনার একটি বক্তব্য খুঁজছিলাম যা অবশ্যই উদার মানবতাবোধের কাছাকাছি হয়। আমাদের

> নাট্যে এমন ভাষা প্রয়োজন, যা হবে ধ্রুপদী কাহিনির বিশালত্ব ধারণে সক্ষম এবং বর্তমান যুগের প্রবাহ উপস্থিত থাকবে। সে দিকে লক্ষ রেখেও আমরা নাট্যভাষার ঘটনাক্রম বিনস্ত করি।[২০]

রসপুরাণ প্রযোজনার সমকালীন বক্তব্য নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহোযোগী অধ্যাপক ড. শাহমান মৈশানকে। তিনি নিবিড় ভাবে নির্বাচিত নাটলিপি ও মহড়া পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লিখেন,

> সাতটি তারার তিমিরে ঢাকা অতীতকে দেখো! আর শোন! কালের স্রোতে ভেসে আসা এই মহাপৃথিবীর জীবন-কল্লোল! রক্তে, হত্যায়, ঘৃণায়, ভয়ে, প্রলয়ে, বিস্ময়ে, কৌতুকে, স্তব্ধতায় আর চিৎকারে কত বিচিত্র দাগ উৎকীর্ণ হয়ে আছে আমাদের আত্মায়, মানবের এই প্রাগৈতিহাসিক আত্মায়! তুমি তো তা জানো! তবু এই ঘোরলাগা প্রহরে তোমাদের আত্মার তলদেশে আমাদের চোখ রাখি আর আমরা আমাদের যৌথ মনে ভাবি–মানুষের সভ্যতা কতদূর এগোল? এই কুহকী প্রশ্নে, এই মায়াবী ডানার স্বপ্নে তাড়িত হয়েই তো তুমি আর আমি আলাদা হতে হতেও এক হয়ে যাই, বিচ্ছেদের মেঘ সরিয়ে হয়ে যাই যৌথ জীবনের ঝর্ণাধারা। এভাবে তোমাদের চোখের তলদেশে জেগে ওঠে এই মহাপৃথিবীর অন্তির্গত প্রাণের প্রবাহ। এখানে জীবন ফুরায় না, কেননা এখানে ভালোবাসা অফুরান।[২১]

ইউটিউব-এ প্রাপ্ত *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভিডিও বিশ্লেষণ করলে নির্দেশক কবিরের উক্তির যথার্থতা লক্ষ করা যায়। নাট্যে ধ্রুপদী কাহিনির বিশালত্ব ধারণ সাপেক্ষে প্রযোজনাকে করা হয়েছে সমকালীন। কাহিনিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছে। নাট্যক্রিয়া সম্পাদনে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতিক্রিয়াতেও বিশ্বাসযোগ্যতা লক্ষ করা যায়।

৩

রসপুরাণ প্রযোজনা নির্মাণ কৌশলে ‘অষ্টবিধ নাট্যরস’ (করুণ, বীভৎস, অদ্ভুত, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীর ও শৃঙ্গার) কীভাবে দর্শক চিত্তে ‘আস্বাদন’ এবং ‘রসরূপতা’ লাভ করে তা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের নাট্যরস বিচার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যের রসবক্তব্য নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে–

ক. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে করুণ রস

মহাভারত মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য বীর চরিত্র অভিমন্যু। শৌর্যে বীর্যে তিনি তার পিতা অর্জুন এবং পিতামহ ইন্দ্রের সমতুল্য ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে মাত্র ষোল বছর বয়সে তার করুণ মৃত্যু হয়। অভিমন্যু প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। তিনি কৌরব সৈন্যবাহিনীর বহুদূরপ্রসারী ক্ষতি করেছিলেন। যা তার পূর্বে আর কেউ সংঘটিত করতে পারেনি। তাই কৌরবরা একত্র হয়ে তাকে আক্রমণ করেন। দ্রোণ, কর্ণ সহ সকলে অধর্মের আশ্রয় নিয়ে একত্রে বিদ্ধ করেন। কৌরব সৈন্যবাহিনী প্রথমে তার ধনুক ছিঁড়েছে, তার সারথিকে হত্যা করে তার রথ গুড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সৈন্য তাকে তীর বিদ্ধ করেছে। এরপরও তিনি মাটি থেকে উঠে– তলোয়ার, গদা এবং রথের চাকা দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে তার কাছে যখন কোনো অস্ত্র ছিলো না তখন কৌরব শিবিরের রথী-মহারথীরা একত্র হয়ে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন। মহাভারতের এই ঘটনাক্রমকে কেন্দ্র করে নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনায় ‘করুণ রস’ আখ্যান নির্মাণ করেন। নিম্নে উক্ত দৃশ্যের ঘটনাক্রম উল্লেখ করা হলো–

দুর্যোধন : আচার্য দ্রোণ, আপনি নিশ্চয় মনে করেন আমরা বধের যোগ্য। তাই আজ যুধিষ্ঠিরকে একা পেয়েও ছেড়ে দিলেন। একদিন প্রীত হয়ে বর দিয়েছিলেন জয়লাভের। কিন্তু আজ তার অন্যথা করলেন। মনে রাখবেন, সাধুলোক কখনোই তার বচন ভঙ্গ করেন না।

দ্রোণ : আমি সর্বদাই তোমার প্রিয় সাধনের চেষ্টা করি। কিন্তু তুমি তা কখনোই বোঝো না। স্বয়ং কৃষ্ণ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জুন যার সেনানী, সে পক্ষের বল ত্র্যম্বক মহাদেব ভিন্ন আর কে অতিক্রম করতে পারে?

দুর্যোধন : আপনি তো পরশুরামের শিষ্য।

দ্রোণ : আমি জানি। তোমায় কথা দিচ্ছি, আজ আমি পাণ্ডবদের কোনো এক মহারথীকে নিপাতিত করবো। আর এমন ব্যূহ রচনা করবো যা স্বয়ং দেবতারাও ভেদ করতে পারবে না। তুমি শুধু যে কোনো উপায়ে অর্জুনকে সরিয়ে রেখ।

দুর্যোধন : তাই হবে।

পাণ্ডব শিবির [যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও অভিমন্যুর প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির : বৎস

অভিমন্যু : আমাকে আশীর্বাদ করুন তাত। আমি যেন দ্রোণের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে পারি।

যুধিষ্ঠির : দ্রোণকে আর কেউ চক্রব্যূহ রচনায় বাধা দিতে পারবে না। তোমার পিতৃগণ, মাতুলগণ এবং সমস্ত সৈন্য সামন্তের বর তোমার নিকট রয়েছে। যাও, ওদের চক্রব্যূহ ভেদ করে এসো।

অভিমন্যু : আমার পিতৃগণের জয় কামনায় আমি অবিলম্বে দ্রোণের চক্রব্যূহে প্রবেশ করবো। কিন্তু পিতা তো আমাকে কেবলমাত্র প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন। যদি ভেতরে গিয়ে কোনো বিপদ হয় বেরিয়ে আসতে পারবো না।

নকুল : অভিমন্যু, তুমি শুধু ব্যূহ ভেদ করে দ্বার তৈরি করো। আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তোমাকে রক্ষা করবো। পাঞ্চাল, মৎস, কৈকেয় প্রভৃতির যোদ্ধারাও যাবেন। তুমি একবার ব্যূহ ভেদ করলে বিপক্ষের প্রধান প্রধান সেনানীদের নিয়ে ব্যূহ বিধ্বস্ত করবো।

অভিমন্যু : পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে আমি সেই রূপ দুর্ধর্ষ হয়ে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করবো। আর সকলেই দেখবে, বালক হয়েও অভিমন্যু কিভাবে দলে দলে শত্রু সৈন্য ধ্বংস করে।

ভীম : পুত্র, পাণ্ডবগণ তোমাকে গুরুভার অর্পণ করেছে। দ্রোণাচার্য অস্ত্র বিশারদ, কৃতী যোদ্ধা, যুদ্ধে নিপুণ। আর তুমি সুখে লালিত। বড়োই আদরের।

অভিমন্যু : দ্রোণ কেন সমগ্র ক্ষত্র মণ্ডলকেও আমি ভয় করি না। দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে আমি যুদ্ধ করতে পারি। বিশ্বজয়ী মাতুল কৃষ্ণ এবং পিতা স্বয়ং অর্জুনও যদি আসেন তবুও আমি ভয় করবো না। আমাকে আশীর্বাদ করুন। [দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য ও দুর্যোধন সহ ব্যূহরচনায় যোদ্ধাদের প্রবেশ]

দুঃশাসন : বীরগণ, অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করতে করতে এগিয়ে আসছে। আপনারা সকলে প্রস্তুত হোন।

দ্রোণাচার্য : এই সুভদ্রা নন্দন তুল্য ধনুর্ধর আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

দুর্যোধন : বীরগণ, অভিমন্যুকে বধ করুন।

দুঃশাসন : আমিই তোকে বধ করবো।

অভিমন্যু : হায়, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী, নিষ্ঠুর, কূটভাষী বীরদেরকে যুদ্ধে দেখছি। আর তুমি, দ্যূত সভায় কটুবাক্যে উন্মত্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরাদিকে ক্রোধান্বিত করেছিলে। আজ তোমাকে শাস্তি দিয়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর নিকট ঋণমুক্ত হবো। (যুদ্ধের আরম্ভ হয়)

অভিমন্যু : পিতো…

(যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হয়)

[পাণ্ডব শিবিরে নিহত অভিমন্যুকে নিয়ে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের বিলাপ]

নির্দেশক কবির, মহাভারতের অভিমন্যুবধের কাহিনিকে তার প্রযোজনায় যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিশোর বীর অভিমন্যুকে নিষ্ঠুর ভাবে বধ হওয়ার মধ্য দিয়ে 'শোক' ভাব পুষ্ট হয়ে করুণ রসের জন্ম দেয়। *নাট্যশাস্ত্র* মতে, 'প্রিয়জনের বধ, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি ভাববিশেষ দ্বারা করুণরস উদ্ভূত হয়।'[২২] কিশোর অভিমন্যুকে নিষ্ঠুর ভাবে বধের ঘটনা এবং অভিমন্যুর 'পিতো' বলে আর্তনাদের মধ্য দিয়ে শোক ভাব প্রকাশিত হয়েছে। করুণ রসের অভিনয় প্রসঙ্গে ভরত বলেন, 'সশব্দরোদন, মূর্ছা, পরিদেবন, বিলাপ, দেহের কষ্ট বা দেহের আঘাত দ্বারা করুণ রস অভিনেয়।'[২৩] দৃশ্যের শেষে ভীম যেভাবে অভিমন্যুর নিথর দেহ নিয়ে বিলাপ করে আর সজল নয়নে যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাতে রসিক দর্শক করুণ রসে আস্বাদিত হয়। উক্ত দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় জনৈক নাট্যজন অনলাইন পত্রিকায় লিখেছেন,

> অভিমন্যু অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করে করে এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যেতে যেতে একসময় বধ হলো। নিজের অবিশ্বাস্য প্রস্থানের কালে অভিমন্যু শুধু পিতাকেই স্মরণ করতে পারলেন। দুঃশাসনের হাতে মৃত পুত্রকে জড়িয়ে ধরে ঘন নৈঃশব্দ্যের ভেতর ভীমের 'পুত্র' বলে সঘন চিৎকার, করুণ হয়ে কানে বাজে।[২৪]

নাট্য দৃশ্যের– আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়ের মাধ্যমে এবং নাটলিপিতে উপযুক্ত সংলাপের মাধ্যমে ঘটে এই করুণ রসের বহিঃপ্রকাশ। মোট কথা, নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনায় করুণ রস সার্থকভাবে অবতারণা করেছেন।

খ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে বীভৎস রস

মহাভারত মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য বধের মধ্যে দুঃশাসন বধ অন্যতম। *রসপুরাণ* প্রযোজনায় অভিমন্যু বধের পর মঞ্চে নির্দেশক দুঃশাসন বধ-এর আখ্যান 'বীভৎস রস' হিসেবে উপস্থাপন করেন। দ্যূতসভায় দুঃশাসন পাণ্ডব পত্নী দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদীর সেই অসহায়ত্বের সময় স্বামী ভীম অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধের সময় দুঃশাসনের বুক বিদীর্ণ করে রক্ত পান করবো। এই প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সতেরোতম দিনে ভীমের হাতে দুঃশাসন বধ হয়। *রসপুরাণ* প্রযোজনায় যুদ্ধরত দুঃশাসন ও ভীম-এর সংলাপ এবং আঙ্গিক অভিনয়ে বীভৎস রসের চিত্র পরিষ্কার ভাবে উঠে আসে। দৃশ্যের ঘটনাক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

> ভীম : অট্টহাস্য করার খুব ইচ্ছা তাই না তোমার দুঃশাসন? অট্টহাস্য হবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি তোমাকে সেই সুযোগ দেব, তবে তা হবে তোমার মৃত্যুর অট্টহাস্য। মৃত্যু তোমার শত ভাইয়ের ওপর অট্টহাস্য করবে। ইতোমধ্যে অনেক পাপী কৌরবের রক্ত আমার গদা পান করেছে। আজ শ্রেষ্ঠ পাপী, ওরে দুঃশাসন তোর পালা।
>
> দুঃশাসন : অদ্ভুত, অদ্ভুত দৃশ্য! বাহ। আমার এখন ঠিক দ্যূত সভার কথা মনে পড়ে গেল। যেমনটা আমি দ্রৌপদীকে সভায় টেনে এনেছিলাম। বৃকোদর ভীম, দ্রৌপদী আসলে কী হয় তোমার? অর্ধাঙ্গিনী না বৌদি? এক্ষেত্রে তো অঙ্গরাজ কর্ণের কথাই বেশি উপযুক্ত। বেশ্যা..., বেশ্যা...।
>
> [উভয়ের যুদ্ধে দুঃশাসন পরাজিত হয়। ভীম দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে যায় এবং তার সামনে দুঃশাসনের বুক ছিন্ন করে নিজে রক্ত পান করে এবং দ্রৌপদী রক্তে কেশ ধৌত করে]

নাট্যশাস্ত্রকার বীভৎস রসের আলোচনায় বলেন, 'অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দদোষ এবং বহুপ্রকার উদ্বেগে বীভৎস রস উদ্ভূত হয়।'[২৫] বীভৎস রসের অভিনয় সম্পর্কে বলেন, 'মুখ চোখের সংকুচন, নাসিকাচ্ছাদন, অবনত মুখ এবং অব্যক্ত পাদপ্রচার দ্বারা বীভৎস রস সম্যকভাবে অভিনেয়।'[২৬] এক্ষেত্রে *রসপুরাণ* প্রযোজনায় নির্দেশক বীভৎস রসের যর্থাথ প্রয়োগ ঘটান। প্রযোজনায় অভিনেতা-অভিনেত্রী আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে দুঃশাসনের বক্ষ যেভাবে খড়্গ দিয়ে বিদীর্ণ করেন এবং তার রক্ত পান করেন, তাতে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, রস ও গন্ধ সবকিছুরই উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যখন অভিনেতা দুঃশাসনের বুক বিদীর্ণ করে রক্ত পান করেন এবং দ্রৌপদী রক্ত দিয়ে কেশ বন্ধন করেন তখন অভিনেতাদের অভিনয়ে– মুখ-চোখের সংকুচন, নাসিকাচ্ছাদন, অবনত মুখ এবং অব্যক্ত পাদপ্রচার পরিষ্কার ভাবে লক্ষ করা যায়। ফলশ্রুতিতে দর্শককুল 'জুগুপ্সা' ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বীভৎস রস আস্বাদন করেন।

গ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে অদ্ভুত রস

রসপুরাণ প্রযোজনায় দর্শক বীভৎস রস আস্বাদনের পরপরই মঞ্চে নির্দেশক উপস্থাপন করেন 'অদ্ভুত রস'। মঞ্চে আবির্ভাব হয় মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র যুধিষ্ঠিরের। শ্রীকৃষ্ণ নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তার আদি বাসস্থানে যাওয়ার পর, পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীও যথাক্রমে দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তারা অনেক ধর্মীয় স্থানে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীসময়ে স্বর্গের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। যাত্রাপথে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা একে একে পড়ে যান। তারা তাদের পূর্বের কৃতকর্মের কারণে মৃত্যু বরণ করেন। শুধু জীবিত ছিলেন যুধিষ্ঠির। কারণ, কথিত আছে যে তার জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করেনি সে তার নশ্বর দেহ নিয়ে স্বর্গে যেতে পারে। সবাইকে হারানোর পর একটি কুকুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়। নাট্যভাষ্যে এ-প্রসঙ্গে ইন্দ্রদেব ও যুধিষ্ঠির কথোপকথন নিম্নরূপ–

ইন্দ্র : হে ধর্ম রাজ যুধিষ্ঠির, তুমি তোমার জন্ম কাল থেকে শুরু করে আজ অবধি সকল কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছ। এমনকি তুমি সকল প্রকার লোভ-লালসা হিংসা-বিদ্বেষ এবং সকল পাপ-কার্য থেকে দূরে থেকেছ। তোমার ন্যায় ও নিষ্ঠাবান কাজে আমি মুগ্ধ হয়েছি। হে যুধিষ্ঠির, তুমি তোমার পুণ্যের জোরে আমার তুল্য অমরত্ব, ঐশ্বর্য সিদ্ধি এবং স্বর্গ সুখের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার সাথে ইন্দ্রপুরিতে চলো। সেখানে তোমার জন্য অসীম সুখ ও অপার সৌন্দর্য অপেক্ষা করছে।

যুধিষ্ঠির : হে দেবরাজ ইন্দ্র, আমার সাথে যারা ছিলো প্রত্যেকেই দেহত্যাগ করেছে। বর্তমানে এই কুকুরটি ছাড়া আমার কেউ নেই। আমি ইন্দ্রপুরিতে আমার কুকুরটিকেও সাথে নিতে ইচ্ছে করি।

ইন্দ্র : সঙ্গে শ্বাপদ নিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। তুমি তুচ্ছ কুকুরের জন্য স্বর্গ সুখ পেয়েও তা তুচ্ছ জ্ঞান করছ? তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ করো।

যুধিষ্ঠির : হে সহস্রলোচন, আমি আর্য হয়ে অনার্যের ন্যায় আচরণ করতে পারি না। আমি মনে করি, শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্ত্রীবধ, মিত্রবধ এবং ব্রহ্মস্বহরণ, এই চার কার্যে যে রূপ পাপ হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলে সেই রূপ হয়। তাই মহারাজ, ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করে আমার পক্ষে স্বর্গসুখ লাভ করা সম্ভব নয়।

ইন্দ্র : হে ধর্মরাজ, তুমি আবারও একবার তোমার সততার পরিচয় দিলে। তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া আছে। তুমি এ জগতের মাহাত্ম্যহীন কুকুরের জন্য ঈপ্সিত বস্তু পেয়েও দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। শুরু থেকে আজ অবধি যতো পরীক্ষা আমি তোমার নিয়েছি, তুমি সবগুলোতেই উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সত্যি প্রীত। তাকিয়ে দেখো, তোমার সঙ্গে কুকুরটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ধর্ম। তাই হে ভারতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশরীরে স্বর্গারোহণ করে অক্ষয়লোক লাভ করবে। [যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ]

উপর্যুক্ত এই দৃশ্য *রসপুরাণ* নাট্যে 'অদ্ভুত রস' রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। অদ্ভুত রস সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন, 'তারপর অদ্ভুতরস, এর স্থায়িভাব বিস্ময়। দিব্য ব্যাপার দর্শন, ঈপ্সিত দ্রব্য লাভ, উত্তম গৃহ ও দেবমন্দিরে গমন, সভানুষ্ঠান, বিমান বিহার, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা এই (রস) উৎপন্ন হয়।'[২৭] অদ্ভুত রস অভিনয় সম্পর্কে বলেন, 'এর অভিনয় চক্ষুর বিস্ফারণ, অনিমেষ দৃষ্টি, রোমাঞ্চ, অশ্রু, ঘর্ম, হর্ষ, প্রশংসা, দান, হাহাকার, হস্ত, বাহু, মুখ ও চক্ষুর সঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা প্রযোজ্য।'[২৮] ভরত আরো বলেন, 'অতিশয়োক্তি, বাক্য, চরিত্র, কর্ম ও রূপের আতিশয্য–এই বিশেষ ব্যাপারগুলি দ্বারা অদ্ভুতরস হয়।'[২৯] *রসপুরাণ* প্রযোজনায় মঞ্চের কেন্দ্র থেকে যে সুসজ্জিত রথ সদৃশ দোলনা নেমে আশে তা ভরতের অদ্ভুত রস সম্পর্কে উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দর্শক দিব্য ব্যাপার দর্শন, বিমান বিহার, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির সাক্ষী হয়। দর্শকের মধ্যে 'বিস্ময়' ভাব উৎপন্ন হয় এবং অদ্ভুতরস আস্বাদন করেন। এ-প্রসঙ্গে অনলাইন পত্রিকায় নাট্যজন লিখেছেন, 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্য আকাশ থেকে নেমে এল দোলনা, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝে আলো আর রঙের ভেতর দিয়ে সেই আকাশযানে চড়ে উঁচুতে উঠে যেতে যেতে যুধিষ্ঠিরের শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার স্মৃতি প্রায় সঙ্গীতের মতো, পুনঃপুন দোলা দিয়ে যায়।'[৩০] নির্দেশক কবির, অভিনেতাকেও বেশ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করিয়েছেন। অভিনেতার অভিনয়ে– চক্ষুর বিস্ফারণ, অনিমেষ দৃষ্টি, রোমাঞ্চ, অশ্রু, ঘর্ম, হস্ত, বাহু, মুখ ও চক্ষুর সঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাবের প্রয়োগ ঘটান। অতএব, যে দর্শক ভাষা বোঝে না বা কানে শোনে না সেও শুধু চোখে দেখেই দৃশ্যের ভাব বুঝে অদ্ভুত রস অনুভব করতে পারে।

ঘ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে রৌদ্র রস

'রৌদ্র রস'-এর আখ্যান ভাষ্য নির্মাণে নির্দেশক ভগবত পুরাণে শিবের তাণ্ডব অংশ ব্যবহার করেন। 'শিব তাণ্ডব' একটি শক্তিশালী এবং ছন্দময় নৃত্য যা মহাজাগতিক শক্তির একটি ঐশ্বরিক নৃত্য বলে মনে করা হয়। পুরাণে বর্ণিত শিব পত্নী সতী যখন রাজা দক্ষ কর্তৃক স্বামী শিবের অপমান সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তখন শিব তাঁর শোক এবং ক্রোধে যে ধ্বংসাত্মক রুদ্র তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিলেন তাকেই রৌদ্ররস রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে *রসপুরাণ* আখ্যানে। আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

[শিবের ধ্যানরত অবস্থায় মুনি তার কাছে আসে]

মুনি : মহাদেব..., ধ্যান থেকে বেরিয়ে আসুন মহাদেব। দক্ষ কর্তৃক আপনার অপমান সহ্য করতে না পেরে মাতা সতী যজ্ঞাগ্নিতে দেহ ত্যাগ করতে চলেছেন। আর চুপ থাকবেন না হে দেব। না এভাবে চলতে দেয়া যায় না ।

মহাদেব : দুরাচারী দক্ষ, একি করলি তুই। আত্ম দম্ভে মত্ত হয়ে আমার সতীকে দেহ ত্যাগে বাধ্য করলি? এতদিন সকল পাপের ক্ষমা তুই পেয়েছিস । আজ নিজ পাপে নিজের ও জগতের ধ্বংস ডেকে আনলি।

[শিবতাণ্ডব শুরু হয়]

নাট্যশাস্ত্র এই রস সম্পর্কে বলেন, 'যুদ্ধে প্রহার, হত্যা, অঙ্গবিকৃতি, অঙ্গের ছেদন, ভেদন সংগ্রামে বিক্ষোভ প্রভৃতি দ্বারা রৌদ্র রস উদ্ভূত হয়।'[৩১] রৌদ্র রসের অভিনয় সম্পর্কে বলেন, 'নানা অস্ত্রক্ষেপ, মস্তক, কবন্ধ ও হস্তছেদন– এই সকল বিশেষ বিষয়ের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।'[৩২] পরবর্তী শ্লোকে বলেন, 'এই প্রকার রৌদ্ররস দৃষ্ট হয়; এতে বাক্য, অঙ্গ ও কাজকর্ম হয় ভীষণ, অস্ত্রাঘাত বহুল পরিমাণে থাকে এবং গতিবিধি হয় উগ্র।'[৩৩] *রসপুরাণ* প্রযোজনায় রাজা দক্ষের প্রতি শিবের ক্রোধের ফলে ঘটেছে রৌদ্র রসের পরিবেশ এবং অভিনয় কালে দর্শকচিত্তে এই রস উদ্বুদ্ধ হয়। দৃশ্যে নির্দেশক কবির, যে স্থান-কাল, বেশ-ভূষা ব্যবহার করেছেন তা ছিল যথার্থ। দর্শক চিত্তে 'ক্রোধ' ভাব জাগ্রত করতে দৃশ্যে– বাচিক, আঙ্গিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়ের উপযুক্ত প্রয়োগ ঘটান। উপরিউক্ত রৌদ্র রসের আখ্যান ভাষ্যে শিবের সংলাপে– ক্রোধ প্রকাশ, তিরস্কার, তাড়ন, পাটন ও ভেদন প্রভৃতির প্রকাশ রয়েছে যা রৌদ্র রসোদ্বোধের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই রসের অভিনয়ে নির্দেশক চোখ-রাঙান, ভ্রুকুটি ও দন্তে ওষ্ঠে-পীড়ন প্রভৃতি স্বাত্ত্বিক অভিনয়ের প্রয়োগ করেন। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রৌদ্র রসের অভিনয় সম্পর্কে যে অস্ত্রক্ষেপ, মস্তক, কবন্ধ ও হস্তছেদন কথা বর্ণনা হয়েছে তা নির্দেশক সার্থক ভাবে ব্যবহার করেন। অবশেষে বলা যায় এই দৃশ্যে, ক্রোধ ভাব যথাযথ ভাবে পুষ্ট হয়ে রৌদ্র রস লাভ করে।

৬. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে হাস্য রস

রসপুরাণ প্রযোজনার পঞ্চম দৃশ্য 'হাস্য রস' আশ্রিত। আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরস যতই চটুল বা লঘু হোক না কেন, সেখানে জীবনের গুরুত্ব ও গভীরতা থাকে। হাস্যরসের গূঢ় রহস্য ব্যক্তিকে নানা দিক থেকে ব্যাপ্ত করে।[৩৪] সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায় যে, উপরিউক্ত অন্যান্য রসের সঙ্গে হাস্যের মিল হয় না। নাট্যে 'ড্রামাটিক রিলিফ' দরকার হয়। নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনার যথাস্থানেই হাস্য রস আখ্যান ব্যবহার করে ড্রামাটিক রিলিফ তৈরির পাশাপাশি নাট্যে গুরুত্ব ও গভীরতা আরোপ করেছেন। উপরিউক্ত রস আশ্রিত দৃশ্যের চরিত্রগুলো ভীষণ মানসিক চাপে পীড়িত। পাশাপাশি দর্শকও সেই ভাব বহন করে চলছিল। নাট্যের এ অবস্থায়ই হাস্যের অবকাশ ছিল। যা নির্দেশক সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন। শূদ্রক বিরচিত *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে এর আখ্যান ভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জুয়ার আড্ডা থেকে জুয়াড়ি জুয়া খেলে হেরে অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে পালায়। তার পিছু নেয় জুয়ার আড্ডার মালিক মাথুর। তাদের পরস্পরের বুদ্ধির যুদ্ধে নির্দেশক তৎকালীন সময়ের অসংগতিপূর্ণ ঘটনার আভাস সংলাপে যুক্ত করে হাস্য রস সৃষ্টি করেছেন। আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

সংবাহক : জুয়ো খেলার সাধ আমার মিটেছে। না খেলেই বা কী করবো। বাঁচতে হলে কিছু অর্থ তো চাই। দরিদ্র মানুষের অর্থ উপার্জনের আর কি কোনো পথ খোলা আছে? জিতলে কথা ছিল না। হেরে বসে আছি যে। অঙ্গরাজ কর্ণের শক্তি অস্ত্রে ঘটোৎকচ যেমন মরেছিল তেমনি শক্তি

ঘটিতে মরেছি আমি। দশ স্বর্ণমুদ্রা হেরেছি। যার সঙ্গে হেরেছি সেই জুয়াড়িটা আর জুয়ার আড্ডার মালিক আমাকে তাড়া করেছে। জুয়ারিটা যখন তার হিসাব মিলাতে গেল তখনই আমি চম্পট দিয়েছি। এখন এই বড় রাস্তায় আমি কার আশ্রয় নিই? ঐতো একটি মন্দির, দেব বিগ্রহটিও নেই। ভালোই হলো, পিছুপা হেঁটে মন্দিরে শূন্য বেদিতে দেববিগ্রহ সেজে দাঁড়িয়ে থাকি। পিছু পা করে হেঁটে গেলে ওরা ভাববে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছি।

মাথুর : পালাবি কোথায়? ওকে ধরবোই। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, কোথাও লুকোতে পারবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও ওর রক্ষা নেই। আমি মাথুর, জুয়ার আড্ডার মালিক। জুয়ো খেলা কেউ কখনো আমায় ধোঁকা দিতে পারেনি। কি পেরেছে?

জুয়ারি : পেরেছে।

মাথুর : পারেনি। এই এদিকে এসো।

জুয়ারি : কী বুঝলে?

মাথুর : ধূর্তটা পিছুপা হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করেছে।

জুয়ারি : চলোতো গিয়ে দেখি। [ভেতরে প্রবেশের পর]

সংবাহক তো এখানে নেই। তুমি আমি ব্যতীত তৃতীয় কোন প্রাণীও দেখছিনা। শুধু দেখছি একটি দেব বিগ্রহ। তাও আবার কাষ্ঠ মূর্তি।

মাথুর : কী বলছ হে প্রস্তর মূর্তি। মা সরে গিয়েছে।

জুয়ারি : মাকে একটু সোজা করে দেই।

মাথুর : ও বেটা সংবাহককে যখন পাওয়া যাবে না, তখন এস দুদান পাশা খেলেনি।

জুয়ারি : বেশতো ভালো বলেছ। [কড়ি বের করে খেলতে থাকে]

সংবাহক : জুয়ো খেলা দেখলেই আমার গা কেমন জ্বলে। জুয়ো খেলাও যা, মেরু পর্বতের চূড়া থেকে ঝাঁপ দেওয়াও তা। তবে কড়ির আওয়াজ শুনলেই মনটা কেমন যেন করে। না মনকে আর নরম হতে দিচ্ছি না। আহ! কড়ির আওয়াজ যেন কোকিলের স্বর।

জুয়ারি : চালটা আমার ছিল।

মাথুর : আমার চাল।

সংবাহক : এ আমার চাল। এক চাল খেলবো না?

জুয়ারি : মূর্তিমান ধরা দিয়েছে যে।

মাথুর : বের কর আমার দশ স্বর্ণমুদ্রা।

সংবাহক : দেবো বলেছি তো।

মাথুর : এক্ষুণি চাই।

সংবাহক : এখন অর্ধেক দিচ্ছি। বাকি অর্ধেক তুমি মাফ করে দাও।

মাথুর : দিবি তো?

সংবাহক : দেবো।

মাথুর : ঠিক আছে।

সংবাহক : তুমিও শোনো। এখন অর্ধেক দিচ্ছি বাকি অর্ধেক তুমি মাফ করে দাও।

জুয়ারি : ঠিক আছে। যথা লাভ।

সংবাহক : বেশতো! অর্ধেক তুমি মাফ করলে আর বাকি অর্ধেক তুমি। এবার আমি যাই।

মাথুর : বোকা ঠাউরেছো?

জুয়ারি : ব্যাটা বদমাশ। এক্ষুণি মুদ্রা বের কর।

সংবাহক : কোত্থেকে দেবো নেই তো।

মাথুর	:	তোর বাপকে বেচে দে।
সংবাহক	:	বাপ নেই তো।
জুয়ারি	:	মাকে বেচে দে।
সংবাহক	:	মাও নেই।
মাথুর	:	তাহলে নিজেকে বেচ ব্যাটা।
সংবাহক	:	নিজেকে? আচ্ছা ঠিক আছে। আমি নিজেকে বেচে মুদ্রা শোধ করব। আমাকে বড় রাস্তায় নিয়ে চলো। [বাজারে যাওয়ার পর] এই যে ভাই শুনছেন, মানুষ কিনবেন? মাত্র দশটি স্বর্ণমুদ্রা। কী বলছেন কিনবেন না? কেউ কিনছে না। কেউ কিনছে না, মানুষ হিসেবে কি কোন দাম নেই আমার?
মাথুর	:	দেখাচ্ছি মজা চল ব্যাটা।

হাস্য রস বিষয়ে *নাট্যশাস্ত্রে* বিবৃত হয়েছে,

> হাস্যের স্থায়ীভাব হাস। এই (হাস্য) বিকৃত বেষ, অলংকার, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক, অসৎ প্রলাপ, বিকলাঙ্গদর্শন, দোষখ্যাপন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গণ্ডস্থলের কম্পন, নেত্রের বিস্তার ও আকুঞ্চন, ঘর্ম, মুখরাগ, পার্শ্বদেশ হস্তস্থাপন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য। এর ব্যভিচারিভাব আলস্য, অবহিত্থা, তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ ও অসূয়া প্রভৃতি। এই (রস) দ্বিবিধ– আত্মগত ও পরগত। যখন কেউ নিজে হাসে তখন আত্মগত। যখন অপরকে হাসানো হয় তখন পরগত।[৩৫]

পরের শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে, 'বিপরীত অলংকার, বিকৃত আচার, কথা, বেষ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হেতু কেউ হাসলে যে রস হয় তা হাস্য নামে কথিত। বিকৃত রূপ, বাক্য অঙ্গভঙ্গী ও বেষের দ্বারা লোককে হাসায় বলে (এই) রস হাস্য নামে জ্ঞাত।'[৩৬] হাস্য রসের দৃশ্যে নির্দেশক যে স্থান-কাল, বেশ-ভূষা ব্যবহার করেছেন তা ছিলো নাট্যশাস্ত্র আশ্রিত। মাথুর, জুয়ারি ও সংবাহক চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তাদের– আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য ছিলো যথাযথ। মুখের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রায়ণের মাধ্যমে অভিনেতারা হাস্য রস ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সংবাহক চরিত্রের রূপদানে– বিকৃত বেষ, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক, অসৎ প্রলাপ, বিকলাঙ্গ আচরণ সবকিছুই 'হাস' ভাব জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবতা হলো চরিত্রের অবয়বের বিকৃতি মানুষের চিত্তে হাস্যরস জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। এ-প্রসঙ্গে নাট্য সমালোচক বলেন, '[...] অভিনেতাদের শারীরিক নমনীয়তার সাথে রসঘন সংলাপ, দৃশ্যকে হাসির কড়াইয়ে ভেজে মচমচে রাখে।'[৩৭] অভিনেতাদের অভিনয়েও নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত– ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গণ্ডস্থলের কম্পন, নেত্রের বিস্তার ও আকুঞ্চন, ঘর্ম, মুখরাগ, পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপন প্রভৃতি অনুভাবের লক্ষণ বর্তমান ছিলো। মোট কথা এই দৃশ্যে, হাস ভাব যথাযথ ভাবে পুষ্ট হয়ে হাস্য রস লাভ করে। সর্বোপরি, হাসির একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং এই উপোযোগিতা *রসপুরাণ* নাট্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়েছে।

চ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে ভয়ানক রস

হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের পর মঞ্চে রামায়ণ থেকে গৃহীত জনপ্রিয় কাহিনি রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক রাম পত্নী সীতা হরণের দৃশ্যটি সংঘটিত হয়। যা *রসপুরাণ* প্রযোজনার ষষ্ঠ দৃশ্য ও 'ভয়ানক রস' রূপে নাট্যে উপস্থাপিত হয়েছে। রামায়ণে রাম সীতার অনুরোধে সোনার হরিণ ধরতে গভীর জঙ্গলে

প্রবেশ করেন। যখন সোনার হরিণ ছদ্মবেশধারী মারীচ রামকে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে যায়, তখন সীতার চারপাশে নিরাপত্তার জন্য রেখা একে দিয়ে লক্ষ্মণ রামের খোঁজে বের হয়। রাবণ এই সুযোগে সন্ন্যাসী বেশে সেখানে পৌঁছে কৌশলে সীতাকে লক্ষ্মণ রেখা অতিক্রমণে বাধ্য করেন। সীতা রেখা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে রাবণ তাকে অপহরণ করেন। প্রযোজনার আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

রাবণ : মাতা..., কিছু অন্ন দান করুন। মাতা... ।

সীতা : প্রণাম ব্রহ্মচারী।

রাবণ : এই পথশ্রমে আমি অনেক ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। বনের মধ্যে এই কুটির দেখে বড় আশা নিয়ে এসেছি। আমায় কিছু অন্ন দান করো মাতা।

সীতা : নিশ্চয়ই , আপনি কিছুন বিশ্রাম করুন। আমি আপনার জন্যে ভোজন নিয়ে আসছি। আসন গ্রহণ করুন ব্রহ্মচারী। [রাবণ ধ্যানে বসে এবং পরিক্রমণ শেষে অন্ন সংগ্রহ করে সীতা অন্ন নিতে অনুরোধ করে]

রাবণ : ধ্যানরত অবস্থায় আমি উঠে যেতে পারি না। তুমি আমায় এসে দিয়ে যাও।

সীতা : কিন্তু আমি তো এই রেখার বাহিরে যেতে পারবো না।

রাবণ : তুমি আমায় তিরস্কার করেছো দেবী। অতিথি নারায়ণ। আর নারায়ণ অসন্তুষ্ট হলে তা গৃহস্থের জন্যে মঙ্গলকর কিছু হবে না। [রাবণ চলে যেতে উদ্যত হন]

সীতা : যাবেন না ব্রহ্মচারী। অপরাধ মার্জনা করুন। আমি নিজেই আসছি। [অন্ন দান করা হয়]

রাবণ : হে রৌপ্যব্যঞ্জনবর্ণা, তোমাকে পঞ্জিনীর ন্যায় দেখছি। তোমার নেত্র নির্মল ও আয়ত। তারকা কৃষ্ণবর্ণ। উরুদ্বয় হস্তিশূন্ডের ন্যায়। নিতম্ব বিশাল ও স্থুল। তোমার পতিকে ধন্য মনে করি। কে তুমি? কার নারী? কোথায় থেকে এসেছ? এই রাক্ষসবেষ্টিত পঞ্চবটী বনে একাকী কী করছো?

সীতা : আমি রামের পত্নী, সীতা। পিতৃসত্য, পালনের জন্যে তিনি অযোধ্যা ত্যাগ করে এখানে এসেছেন। লক্ষ্মণ তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তিনিও ব্রহ্মচারী হয়ে জ্যেষ্ঠকে অনুসরণ করেছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী শীঘ্রই রুরু, বরাহ প্রভৃতি পশু বধ করে আসবেন। আপনার পরিচয় বলুন? এই বনে একাকী বিচরণ করছেন কেন?

রাবণ : আমি মহাপ্রতাপশালী রাক্ষসরাজ রাবণ। দেবাসুর ও মানুষ যক্ষ আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমাকে দেখার পর আমার আর নিজ পত্নীদের প্রতি আর কোন অনুরাগ নেই। আমি বহুস্থান থেকে উত্তম পত্নী সংগ্রহ করেছি। তুমি তাদের সকলের উপরে আমার প্রধান মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার মহাপুরী আছে। তা সাগরে বেষ্টিত এবং পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত। তুমি সেখানকার কাননে আমার সঙ্গে বিচরণ করবে। আমার পত্নী হলে পাঁচ হাজার সুবেশা দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকবে।

সীতা : যিনি মহাগিরির ন্যায় স্থির। মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর। সেই মহেন্দ্র সদৃশ রামের পতিব্রতা পত্নী আমি। তুমি শৃগাল হয়ে সিংহীকে কামনা করছো? রাক্ষস, তুমি ক্ষুধিত সিংহ ও সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটন করতে চাইছো। সূচী দ্বারা চক্ষু মার্জন ও জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করতে চাইছ। মক্ষিকা ঘৃত ভোজন করলে ঘৃত জীর্ণ হয় না বরং মক্ষিকাই মরে।

রাবণ : আমি কুবেরের বৈমাত্রের ভ্রাতা। মহাপ্রতাপশালী রাবণ। লোকে আমাকে মৃত্যু তুল্য ভয় পায়। আমি কুবেরের আকাশগামী পুষ্পকরথ সবলে হরণ করেছি। এই তুচ্ছ তপস্বীকে নিয়ে তুমি কী করবে। আমার সঙ্গে লঙ্কায় চল। আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকে পস্তাতে হবে।
[রাবণ সীতাকে হরণ করে]

ভয়ানক রস সম্পর্কে ভরত বলেন,

> ভয়ানক রসের স্থায়ীভাব ভয়। তা উদ্ভূত হয় বিকৃতস্বর, সত্ত্ব দর্শন, শেয়াল বা পেঁচার ভয়, উদ্বেগ, শূন্যগৃহ, অরণ্যপ্রবেশ, স্মরণ, আত্মীয়ের বধ, বন্ধন দেখা বা শোনা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা। তার অভিনয়ে করণীয় হস্ত পদের কম্প, নেত্র ঘূর্ণন, রোমাঞ্চ, মুখের বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা। এর ব্যভিচারী ভাবসমূহ হল অবশ ভাব, ঘর্ম, গদ্‌গদ বাক্য, রোমাঞ্চ, কম্প, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণতা, ভয়, মোহ, দীনতা, আবেগ, চপলতা জড়তা, ত্রাস, মূর্চ্ছা, মরণ প্রভৃতি।[৩৮]

ইউটিউব-এ প্রাপ্ত *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভিডিও বিশ্লেষণ করলে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত ভয়ানক রসের কারণগুলো লক্ষ করা যায়। যেমন শুরুতেই নির্দেশক আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যের নাট্যক্রিয়া, বিষয়, স্থান ও চরিত্র স্পষ্ট করেছেন। মঞ্চে লক্ষ্মণ রেখায় আবদ্ধ সীতা এবং সন্ন্যাসী বেশে রাবণ অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত– শরীর, মুখ ও চক্ষুর বিকৃতি, উরুর অবশতা, অবনত মুখের শুষ্কতা, হৃদয়ের স্পন্দন ও রোমাঞ্চ দ্বারা ভয় ভাব প্রকাশ করে নাট্য-মুহূর্তের ভাবমূর্তিকে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তোলেন। ভয়ানক রসের উদ্বোধক কারণগুলোর একটি হলো– অট্টহাস্য, ভূত-প্রেত জাতীয় কিছু দেখা যা নির্দেশক রাবণ চরিত্র চিত্রায়ণে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। রাবণ যখন সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ করেণ তখন নির্দেশক মঞ্চে একাধিক রাবণ চরিত্রের উন্মোচন করেন এবং চরিত্রের ছায়াগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাদা ব্যাক ড্রপের ওপরে প্রতিস্থাপন করেন। এর ফলে রাবণ চরিত্রের প্রচলিত মিথ 'দশমুখ' এবং 'কুড়ি-হস্ত' বিষয়টাও পরিষ্কার হয়। পাশাপাশি রাবণ চরিত্র প্রকাশে মুখোশের ব্যবহার করেন এবং চরিত্র অট্টহাস্য করতে থাকেন যা ছিল চমৎকার এবং একই সাথে ভয়ানক। উক্ত দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় নাট্যজন লিখেছেন, 'রাক্ষসগণ রামের পত্নী সীতাকে অপহরণে যে ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা করে তা ভয়ংকর, রাক্ষসদের মুখ ও মুখোশের ব্যবহার দৃশ্যকে আরও দৃষ্টিগোচর করে তোলে।'[৩৯] নির্দেশক, দৃশ্য উপস্থাপনে আলো-ছায়ার ব্যবহার, রাবণ চরিত্রের বিকৃতস্বর, আবহ সংগীতে শেয়াল বা পেঁচার ধ্বনি এবং অরণ্যের মাধ্যমে ভয় ভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে চরিত্র, স্থান ও পরিবেশকে এমনভাবে নির্দেশক চিত্রিত করেছেন যাতে দর্শক দৃশ্যের মেজাজ বুঝে ভয় ভাবে পুষ্ট হয়ে ভয়ানক রস আস্বাদন করেন।

ছ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে বীর রস

রসপুরাণ প্রযোজনার সপ্তম দৃশ্য 'মেঘনাদ বধ' আখ্যান-আশ্রিত। মঞ্চে দেখা যায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞরত মেঘনাদ, সেখানে অন্যায়ভাবে বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ উপস্থিত হয়। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় অন্যায় যুদ্ধে বীর মেঘনাদ প্রাণ হারায় লক্ষ্মণের হাতে। যা নাট্যে 'বীর রস'-এর উপস্থাপন করে। কাহিনি গৃহীত হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক রচিত *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর ষষ্ঠ সর্গ থেকে। তবে মহাকাব্য রামায়ণ হচ্ছে এই বিষয়বস্তুর মূল প্রেরণা। প্রযোজনায় বীর রসের আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

লক্ষ্মণ : মেঘনাদ

মেঘনাদ : অস্ত্রহীন, নিঃসহায়ের জাগতিক্ষাবৃত্তের ওপর তোর এই পরাক্রম? যজ্ঞ ভঙ্গ করেছো, তাই বলে ভেব না, সমর মাঝে বিজয় লাভ হবে লক্ষ্মণ ।

লক্ষ্মণ : বড় বীর হয়ে, যুদ্ধ না করে, মায়াজালে চোখ ধাঁধিয়ে এখানে বসে যজ্ঞ সাধন করছো? তোমার এ শ্রম ব্যর্থ হয়েছে, দিব্যবর ধ্বংস হয়েছে মেঘনাদ।

মেঘনাদ : একে তোমার প্রভাব বলে গৌরব করো না সৌমিত্রি। তোমার এই সাময়িক গৌরব শুধু আমার খুল্ল-তাত বিভীষণেরই বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল।

লক্ষ্মণ : প্রকৃত বীর হলে বাক্যে নয়, অস্ত্র ধারণ করো।

মেঘনাদ : স্বেচ্ছায় মৃত্যুদেবতাকে আহ্বান করছো। অজেয় পরাক্রমশালী বীর মেঘনাদকে জয় করা তোমার মতো বালকের কর্ম নয়। আজই তোমার আমার শেষ যুদ্ধ। [বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ : দাঁড়াও ধীমান।

মেঘনাদ : মহাদেবের মতো বীর তোমার ভাই কুম্ভকর্ণ। নিকষা সতী তোমার জননী। সেই তুমি এ কাজ কি করে করলে তাত? একটিবার, শুধু একটিবার দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। ছাড়ো দ্বার। যাবো অস্ত্রাগারে।

বিভীষণ : রাঘবের দাস হয়ে তোমায় ছাড়ি কী করে বলো?

মেঘনাদ : এ কী বললে তুমি তাত? তুমি রাঘব দাস? তুমি কে? কোন বংশে জন্মেছ তার সবই কি ভুলে গেছ?

বিভীষণ : মেঘনাদ, বৃথাই বকছো আমায়। ধর্মকে আশ্রয় করার জন্য আমি রঘুকুলপতি রামের আশ্রয় নিয়েছি। অন্যায় তো কিছু করিনি।

লক্ষ্মণ : অস্ত্র ধারণ করো মেঘনাদ।

মেঘনাদ : কাপুরুষের মতো ক্ষত্র ধর্ম ভঙ্গ করে আমায় যুদ্ধে আহ্বান করছো! মনে রেখো, এতে কোনো বীরত্ব নেই। তোমার আমার শেষ যুদ্ধ হোক তবে। [উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মেঘনাদ নিহত হয়]

নাট্যশাস্ত্র-এর বিবরণ মতে,

> বীর রস হয় উত্তম প্রকৃতির ও উৎসাহমূলক; অসংমোহ, অধ্যবসায়; নয়, বিনয়, বল, পরাক্রম, শক্তি, প্রতাপ ও প্রভাব প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা এই রস উৎপন্ন হয়। এর অভিনয় স্থৈর্য, শৌর্য, ধৈর্য, ত্যাগ, নৈপুণ্যাদি অনুভাবের দ্বারা প্রযোজ্য। এর সঞ্চারী ভাব ধৃতি, মতি, গর্ব, বেগ উগ্রতা, ক্রোধ, স্মৃতি ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি।[৪০]

অন্য শ্লোকে পাওয়া যায়, 'উৎসাহ, অধ্যবসায়, বিষাদহীনতা, বিস্ময় ও মোহহীনতা–এই বিবিধ ভাববিশেষ থেকে বীর রস উদ্ভূত হয়।'[৪১] বীর রসের অভিনয় সম্পর্কে নাটশাস্ত্র বলে, 'স্থিতি, ধৈর্য, বীর্য, গর্ব, উৎসাহ, পরাক্রম, প্রভাব ও নিন্দাসূচক বাক্য দ্বারা বীররস সাম্যকরূপে অভিনেয়।'[৪২] নিদের্শক নাটকের এই (বীর রস) দৃশ্যে দর্শকের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মেঘনাদ, লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ চরিত্রের অঙ্গসঞ্চালন, দেহের ও চোখ সাজসজ্জা, রঙ ইত্যাদি সব কিছু নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত সেই– স্থিতি, ধৈর্য, বীর্য, গর্ব, উৎসাহ, পরাক্রমসহ রনং-দেহী মূর্তিকে প্রকাশ করছে। নির্দেশক এই দৃশ্যে সংলাপের চেয়ে, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফুটিত করেছেন। সেহেতু বলা যায় কেবলমাত্র 'উৎসাহভাব' দ্বারা দৃশ্যে চরিত্রের অধ্যবসায়, বিষাদহীনতা, বিস্ময় ও মোহহীনতা ইত্যাদিকে প্রকাশের মধ্যমে নাট্য কাহিনিকে অর্থপূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং দর্শক চরিত্রের বিনয়,পরাক্রম, শক্তি, প্রতাপ ও প্রভাব প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা দৃশ্যের মেজাজ বুঝে ভাবে পুষ্ট হয়ে বীর রস আস্বাদন করেন।

জ. *রসপুরাণ* প্রযোজনা আখ্যানে শৃঙ্গার রস

রসপুরাণ প্রযোজনার সর্বশেষ দৃশ্য 'রাধা-কৃষ্ণ' আখ্যান-আশ্রিত। লোকসমাজে প্রচলিত 'রাধা-কৃষ্ণ'র প্রেম সম্পর্কিত লোক গল্প অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য অবলম্বনে এই দৃশ্য। লোকসমাজে প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণ কীভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রণয় করতেন, গল্প করতেন; খুনসুটি করতেন একে অপরের সাথে; দুজন দুজনার সাথে সাক্ষাৎ না হলে কীভাবে রাধা তার বাঁশির সুরে মোহিত হতেন; কী প্রকারে একে ওপরের জন্য অপেক্ষা করতেন যমুনার পারে; তাঁদের– সেইসব মনে মনে কথা বলা, চোখে চোখ রাখা এবং অনুভবের কাহিনি নিয়ে নির্দেশক সার্থক ভাবে চিত্রিত করেন শৃঙ্গার রস। মণিপুরী নৃত্য আঙ্গিকে নির্মিত এই দৃশ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় আখ্যান দেখানো হয় যেখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনে জীবনে অপার সুখ-শান্তির ইঙ্গিত করা হয়। মঞ্চে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী রাধা-কৃষ্ণ রূপে যুক্ত হয় এই দৃশ্যে; জন্ম দেয় শৃঙ্গার রসের। বাঁশির সুরে মঞ্চ পরিকল্পনার শূন্যয়াতন বৃন্দাবন কাননে পরিণত হয়। এই বাঁশির সুর শুনে মঞ্চে প্রবেশ করেন শ্রীরাধা। আখ্যান ভাষ্য নিম্নরূপ–

কৃষ্ণ : চন্দ্রাবতী রাধে, দেখো বৃন্দাবন আজি ফুলে ফলে শোভিত হয়েছে। সেখানে ভ্রমরের সুললিত গুঞ্জন শুনে মানুষতো দূরের কথা, দেবতারাও মোহিত হয়ে যায়। এ স্থানে যে অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যাবলি রয়েছে, তা আমি ছাড়া কেউ জানেনা। অনুমতি করো, তোমাকে সে সব দেখাই। সে স্থানে আমাকে ছাড়া কাউকে সঙ্গে নিও না।

রাধা : তোমাকে সঙ্গী করেই বনে যাবো। কিন্তু, আমার সখীদের সঙ্গ কেমন করে এড়াবো? ওগো কানাই, আমার যতো সখীদের তুমি দেখছ, তাদের কারো মন ভালো নেই। যেন সখীদের এই আকুলতা দূর হয়, তুমি এমন কোনো উপায় স্থির করো।

কৃষ্ণ : ওলো রাধে, তুমিতো আমার মনের কথাই বলেছ। আমি বহু শরীর ধারণ করে গোপীদের মাঝে কেলিবিলাস করবো। তাদের সকলের হৃদয় জয় করে নেবো। তুমি যেনো রুষ্ট হয়ো না।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে *রসপুরাণ* প্রযোজনায় নির্দেশক নাট্যতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে আখ্যানে শৃঙ্গার রস দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন। এই দৃশ্যটি এভাবে না থাকলে গোটা নাটকটাই হয়ে পড়তো– যুদ্ধ বর্ণনা, আস্ফালন, কোলাহল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। কোন বৈচিত্র্য থাকতো না। সুতরাং নির্দেশক বৈচিত্র্য আনার জন্যও দৃশ্যে শৃঙ্গার রসের অশ্রয়ে রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় উপাখ্যান যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার রস সম্পর্কে ভরত বলেন,

> [...] শৃঙ্গার রস শৃঙ্গার রতিনামক স্থায়ীভাব থেকে উদ্ভূত ও উজ্জ্বল বেষাত্মক। যথা– পৃথিবীতে যা কিন্তু শুভ্র, পবিত্র, সুদর্শন তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত হয়। যে উজ্জ্বলবেষ পরিহিত সে শৃঙ্গারবান্ বলে অভিহিত হয়। যেমন, লোকের নাম গোত্র, বংশ ও আচার থেকে উৎপন্ন ও প্রামাণ্য ব্যক্তির উপদেশানুসারে হয়, তেমনই নাট্যসংক্রান্ত এই রস ও ভাবসমূহের এবং অন্যান্য বিষয়ের নাম হয় আচার থেকে উৎপন্ন এবং প্রামাণ্য লোকের উপদেশ অনুসারে সিদ্ধ। এইরূপে এই আচারসিদ্ধ হৃদয়গ্রাহী রস উজ্জ্বলবেষাত্মক বলে শৃঙ্গার (নামে অভিহিত)। ঐ (রস) স্ত্রীপুরুষ থেকে উৎপন্ন এবং উত্তম যুবাপুরুষের প্রকৃতিসম্পন্ন।[৪৩]

অন্য শ্লেকে পাওয়া যায়,

> ঐ (রসের) স্থান দুইটি, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। তার মধ্যে সম্ভোগ (শৃঙ্গার) ঋতু, মালা, অনুলেপন, অলংকার, প্রিয়জনসঙ্গ ও অতিসুন্দর গৃহের উপোভগ, প্রমোদোদ্যানে গমন, অনুভূতি, শ্রবণ, দর্শন, ক্রীড়া, লীলাদি বিভাব

> দ্বারা উৎপন্ন হয়। নেত্রচাতুর্য, ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ সুন্দর গতি, মধুর অঙ্গহার ও বাক্যাদি অনুভাব দ্বারা সেই (রসের) অভিনয় প্রযোজ্য। ব্যভিচারী ভাবগুলি হয় ভয়, আলস্য ও জুগুপ্সাবর্জিত। বিপ্রলম্ভকৃত (শৃঙ্গার) নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, শ্রম, চিন্তা, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ, রোগা, উন্মাদ, অপস্মার, জড়তা, মোহ, মরণাদি অনুভাব দ্বারা অভিনেয়।[৪৪]

নির্দেশক শৃঙ্গার রস-আশ্রিত এই দৃশ্যে সংলাপের চেয়ে, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফুটিত করেছেন। এখানে নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য নির্দেশক পুরো মিলনায়তনকে বৃন্দাবন তথা প্রমোদোদ্যানে রূপান্তর করেন। ফলে দর্শকদের মধ্যে তাৎক্ষণিক আবেগ এবং আবেগীয় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ-প্রসঙ্গে নাট্যজন বলেন,

> [...] রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মনোরম দৃশ্যে নরম রঙিন আলোর জ্যোৎস্নায় চারদিক থেকে ঝুলে পড়া ফুলের লহরি পুরো মিলনায়তনকে বৃন্দাবন করে তুলল, প্রেমে মোহিত দর্শকরা হয়ে উঠল রাসলীলার অংশ। রস থেকে 'রাস' শব্দের উৎপত্তি। 'রাস' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর রস। এই মধুর রস দিয়েই রসপুরাণের সমাপ্তি ঘটে, বা বলা চলে মধুরেণ সমাপয়েৎ।[৪৫]

শৃঙ্গার রস উদ্ভূত করার লক্ষ্যে নির্দেশক দৃশ্যে– ঋতু, মালা, অলংকার, প্রিয়জনের সঙ্গ, সংগীত ও কাব্যের উপভোগ, প্রমোদোদ্যানে গমন রূপটি সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি অভিনয়াংশ ঠিক করার সাথে সাথে দৃশ্যের– মঞ্চ, আলোক, পোশাক, মেক-আপ ও বাঁশির আবহ সংগীত যুক্ত করে মুহূর্তটিকে আরো তীব্র করে তোলেন। নির্দেশক, রাধা-কৃষ্ণ চরিত্রের অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত– নেত্র বদনের প্রসন্নতা, স্মিতহাস্য, মধুর বাক্য, ধৈর্য প্রমোদ ও মধুর অঙ্গভঙ্গী দ্বারা 'রতি' ভাব প্রকাশ করে নাট্য-মুহূর্তের ভাবমূর্তিকে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তোলেন।

৪

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নির্দেশক *রসপুরাণ* প্রযোজনার অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রবচন মানেননি। তিনি 'বীর' বা 'শৃঙ্গার' একটি রসকে অঙ্গী করতে হবে নাটকে এই অনুশাসন প্রত্যাখ্যান করেছেন। এক কথায়, নির্দেশক *রসপুরাণ* নাট্যে অষ্ট রসকেই সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। *রসপুরাণ* প্রযোজনায় প্রতিটি দৃশ্যের একটি লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোকে বলা হয় 'ফললাভ'। এই লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত দৃশ্যের গোড়ার দিকেই দেওয়া হয়। এটা না দিলে দর্শকের কৌতূহলই জন্মে না। এভাবে স্বল্প কথায় উপস্থাপিত এই ইংগিতটিই ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দীর্ঘ কলেবরে অষ্টরসের আটটি দৃশ্যে *রসপুরাণ* নাট্য আকার ধারণ করে। নাট্যজন আসাদুল ইসলাম লিখেছেন, 'পুরো নাটক জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনির দৃশ্যপট, সবগুলো দৃশ্যকে রসের সুতো দিয়ে গেঁথে একটা মালা বানিয়েছে অভিনেতাদের দল।'[৪৬] নির্দেশক কবির, সত্যিই একধরনের বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন। অনুসন্ধান শেষে অষ্ট রসভিত্তিক একটি প্রযোজনা নির্মাণ করে নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছেন। যা সংস্কৃত নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক। বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্কৃত নাট্যের যে চর্চা রয়েছে তা বহুলাংশেই বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। এই প্রযোজনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যচর্চায় সংস্কৃত নাট্যের রূপটি প্রকাশিত হলো এবং সমসাময়িক বিশ্বের ভাষ্য হিসেবে *রসপুরাণ* প্রযোজনার ভূমিকাও স্পষ্ট হলো। *রসপুরাণ* নাট্যের নিরীক্ষা দর্শক সাদরে গ্রহণ করেছে যা এই নাট্য রীতির অবদান ও

সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। নাট্যটি উপভোগ করে অনলাইন পত্রিকা ব্লগে জনৈক সমালোচক লিখেছেন,

> দ্বান্দ্বিক সভ্যতার প্রধান যে লক্ষ্য সেই সুন্দর ও নির্মল জীবনের জন্য অষ্টরসের সমন্বয়ে নির্মিত 'রসপুরাণ' নাটকটি তাই সমকালীন বাংলাদেশের একটি অন্যতম ধ্রুপদী নাটকে রূপ নিয়েছে। নাটকটির চরিত্র নির্মাণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমকালীন দ্বান্দ্বিক সমাজের চিত্রই শেষ পর্যন্ত দর্শকের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে [...]।[৪৭]

মেঘচিল নামে একটি অনলাইন পত্রিকায় জনৈক নাট্যজন লিখেছেন,

> [...] নাটক দেখতে এসে শাস্ত্রসম্মত রসের সন্ধান পাওয়া এবং সেই রসে নিমজ্জিত হওয়া, এটি আনন্দে আটখানা হওয়ার মতো একটি ব্যাপার। শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত, এই সমস্ত নামের সাথে পরিচিত হতে পারাটা কম কথা নয়। নাটকের মধ্য দিয়ে যারা দর্শককে রসসিক্ত ও রসশিক্ষিত করল, তাদের রসবোধ অপরিমেয়। তারা আমাদের নিরস নিরাসক্ত জীবনে রসের আধার, তাদের জীবন রসে টইটম্বুর হোক এই প্রত্যাশা রইল।[৪৮]

বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সংস্কৃত নাট্যের ভাষ্যসমূহ কীভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে সে সম্পর্কে উত্তর মেলে দর্শক নাট্যজন আসাদুল ইসলাম-এর প্রতিক্রিয়াতে। তিনি বলেন, '*রসপুরাণ* নাটকে রসের ভেতরে বিরস বিষয়ের পরোক্ষ উপাদান, রসকে রাজনৈতিক রসায়নে জারিত করেছে শুধু, রসের ঘাটতি ঘটায়নি কিছু।'[৪৯] এ-প্রসঙ্গে সমালোচক রেজা ঘটক আরো বলেন,

> [...] নাটকটি শেষ পর্যন্ত দর্শকের কাছে যেন এক প্রবহমান মহাকালের দ্বান্দ্বিক ঘটনাপ্রবাহের অন্তরালে এক চিরসবুজ অফুরান জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। যেখানে ভলোবাসা কখনো ফুরায় না। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মৃত্যু-ক্ষুধা, ভয়-আতংক, বীরত্ব-আনন্দ, ক্রোধ-শোক শেষে যেখানে মানুষ খুঁজে পায় কেবল অফুরান ভলোবাসা আর সুন্দর ও নির্মল এক জীবন। যে জীবনের লক্ষ্যেই পৃথিবীতে মহাকাল ধরেই এই দ্বান্দ্বিকতা।[৫০]

পরিশেষে, উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রযোজনাটি নাট্যশাস্ত্র মতে অষ্টবিধ নাট্যরস ও ভাব-ব্যঞ্জক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। নানা প্রকার রস ও ভাবের উদ্রেকে সমর্থ এমন অভিনয়ের সুযোগও বর্তমান প্রযোজনায় রয়েছে। আটটি রসের সবগুলো যে থাকতেই হবে এমন কোনো কঠোর বিধান নাট্যশাস্ত্রে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্দেশক নিরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে সংস্কৃত নাট্য চর্চার সম্ভাবনাকেও তিনি জাগ্রত করেছেন। ফলে এই প্রযোজনা আগামীর বাংলাদেশের সংস্কৃত নাট্যচর্চার পথকে আরো মসৃণ করবে বলে আশা রাখা যায়। অবশেষে বলা যায় *রসপুরাণ* প্রযোজনায় অষ্ট ভাব পুষ্ট হয়ে দর্শক রসতা লাভ করে।

তথ্যনির্দেশ

১ মলয় বিকাশ দেবনাথ, "অষ্টরসের রসপুরাণ", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ১০

২ আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৩ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

৩ আহমেদুল কবির, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ব্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

৪ আহমেদুল কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখিত

[৫] দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২০

[৬] দুলাল ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৭] আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৪ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[৮] আহমেদুল কবির, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ক্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[৯] তানভীর আহম্মেদ, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ২ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[১০] আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৪ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[১১] আহমেদুল কবির, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ক্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[১২] রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, *রসসমীক্ষা*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১, পৃ. ৪৩

[১৩] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, খণ্ড ১*, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৭

[১৪] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[১৫] শ্রীরামচরণ তর্কবাগীশ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, [সম্পা. শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়], কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ৬৮

[১৬] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, খণ্ড ১*, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৩

[১৭] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[১৮] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[১৯] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[২০] আহমেদুল কবির, *গবেষণার প্রয়োজনে গৃহীত সাক্ষাৎকার*, ঢাকা: ৪ জুলাই ২০২৪, পৃ. অনুল্লেখিত

[২১] শাহমান মৈশান, "রামায়ণ, মহাভারত ও ধ্রুপদী বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের সংশ্লেষ 'রসপুরাণ' ক্রুশিয়ার", *থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা: ২৫ এপ্রিল ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[২২] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, খণ্ড ১*, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৬

[২৩] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

[২৪] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ* (ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯), পৃ. অনুল্লেখিত

[২৫] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, খণ্ড ১*, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৫০

[২৬] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[২৭] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[২৮] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[২৯] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৩০] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত

[৩১] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, খণ্ড ১*, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৮

[৩২] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[৩৩] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৩৪] আহমেদুল কবির, "কার্টুনে হাস্যরস : অন্তর্দৃষ্টি", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* [সম্পা. এস এম মাহফুজুর রহমান], ঢাকা: ডিসেম্বর ২০২২, পৃ.২৪৪

[৩৫] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র, খণ্ড ১*, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৩

[৩৬] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
[৩৭] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত
[৩৮] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, *খণ্ড* **১**, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, **১৯৯৭**, পৃ. **১৪৯**
[৩৯] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত
[৪০] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, *খণ্ড* **১**, [সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, **১৯৯৭**, পৃ. **১৪৮**
[৪১] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. **১৪৮**
[৪২] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. **১৪৯**
[৪৩] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. **১৪১**
[৪৪] ভরত, প্রাগুক্ত, পৃ. **১৪১**
[৪৫] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত
[৪৬] আসাদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখিত
[৪৭] রেজা ঘটক, *অষ্টরসের সমাহার 'রসপুরাণ'*, ঢাকা: বাঁধ ভাঙার আওয়াজ, ২ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত
[৪৮] আসাদুল ইসলাম, *রসপুরাণ : শাস্ত্রীয় সুধায় মধুরেণ সমাপয়েৎ*, ঢাকা: মেঘচিল, ৫ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত
[৪৯] আসাদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লেখিত
[৫০] রেজা ঘটক, *অষ্টরসের সমাহার 'রসপুরাণ'*, ঢাকা: বাঁধ ভাঙার আওয়াজ, ২ মে ২০১৯, পৃ. অনুল্লেখিত